ইউনিট
১৯

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

ভূমিকা

মানবসম্পদ প্রতিটি জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। জনসংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবসম্পদে পরিণত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা জাতির বোঝা। জাতীয় উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ, জাতি উন্নতি করতে পারে না। নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা জাতির জন্য অভিশাপ। বাংলাদেশে শিক্ষার তেমন বিকাশ ঘটেনি। স্বাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। প্রকৃত শিক্ষার হার আরো কম। কাজেই এ দেশের জনসংখ্যা এখনো মানবসম্পদে পরিণত হতে পারেনি। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পাঠসমূহ আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : মানবসম্পদ : তত্ত্বীয় আলোচনা।
পাঠ-২ : মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা।

পাঠ-১ : মানবসম্পদ : তত্ত্বীয় আলোচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানবসম্পদ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- মানব কখন মানবসম্পদে পরিণত হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন ।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় আলোচনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

মানবসম্পদ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার বলছেন, 'The greatest natural resource of our country is its people' আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, অন্যান্য সম্পদের মতো মানুষও জাতির সম্পদ । বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, কোনো দেশের জাতীয় আয় (GNP) যেমন– তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঠিক তেমনি দেশের মানুষের গুণগত মানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় । সমাজের উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বস্তুসম্পদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে মানবসম্পদ । বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস মানুষকে তাই মানবীয় মূলধন (Human capital) হিসেবে বিবেচনা করেছেন । এই মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ (Human resource) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে । মানবশক্তি তখনই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়, যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা যায় ।

মানব কখন 'মানবসম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হবে?

মানবসম্পদ (Human resource) সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বা জন্মগত নয় । সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানবসম্পদে পরিণত হয় । মানুষ এবং মানবসম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । যেমন–

১. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে । মানবসম্পদের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো স্বাস্থ্য বা দৈহিক সামর্থ্য ।

২. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সামাজিক দিক থেকে উপযোগী বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সামাজিক কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে ।

৩. প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে । এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাকে কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে । এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয় ।

৪. মানবকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান হচ্ছে স্বাক্ষরতা (Literacy) । কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই যখন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্বাক্ষরতা অর্জন করবে ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন কী?

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-

সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো, কোনো রাষ্ট্রের মানুষের সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বাড়ানো যায় এবং তার মাধ্যমে সামাজিক অসাম্য দূর করা যায়। (Human Resource development is a complementary approach to other development strategies, particuiarly employment and reduction of inequalities)। সামাজিক অসাম্য বিষয়টি অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে প্রধানত জড়িত হলেও এক্ষেত্রে বলার কথা এই যে, মানবসম্পদ উন্নত হলে সমাজে সকল মানুষের ন্যূনতম কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। ফ্রেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ মায়ার্স-এর মতে, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।' (Human Resource development is the preocess of increasing the knowledge, the skill and the capacities of all the people in a society.)

মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব

উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উন্নয়ন ঘটাবে মানুষ। অতএব দেশে যত রকমের বস্তুসম্পদ এবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাই দেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

'৬০-এর দশকে সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো মানবসম্পদ উন্নয়নকে একটি সার্বিক উন্নতি এবং আধুনিকায়নের 'ইঞ্জিন' হিসেবে গণ্য করত। বর্তমানে যে কোনো দেশের জনগোষ্ঠী সেই দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সীমিত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও নেদারল্যাণ্ড প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের দক্ষতা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের ওপর। সুতরাং বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হয়। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু টেকসই উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বা যথেষ্ট নয়। সম্পদের অপ্রতুলতা দ্রুত উন্নয়নের জন্য অলঙ্ঘনীয় বাধা নয়। একটি দেশের উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করে সে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর।

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়

হার্বিসন এবং মায়ার্স তাদের গবেষণায় মানবসম্পদ উন্নয়নের ৫টি উপায় উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ :** ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. **আত্ম উন্নয়ন :** যেমন– জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. **পুষ্টি উন্নয়ন :** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়।

৬. সুনীতি শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৭. যৌক্তিকতাবোধ জাগ্রতকরণ তথা বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানস গঠন।

৮. দেশপ্রেমের দীক্ষা প্রদান।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। প্রতিটি দেশেরই জনসংখ্যা রয়েছে। তবে সব দেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদ নয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। ----- মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়।

২। হার্বিসন ও মায়ার্স মানবসম্পদ উন্নয়নে ----- টি উপায়ের কথা বলেছেন।

৩। একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের ----- উন্নয়নের ওপর।

৪। ----- মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার।

৫। মানবসম্পদের ----- ব্যবহারের ওপর জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?

২। মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো কি কি?

৩। মানব কখন সম্পদে পরিণত হয়?

৪। মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়? মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব লিখুন?

(ক) উত্তরমালা

১। পুষ্টি, ২। ৫, ৩। মানবসম্পদের, ৪। শিক্ষা, ৫। সুষ্ঠু

পাঠ-২ : মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন ।
- কিভাবে শিক্ষা ব্যক্তিকে সম্পদে পরিণত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

ভূমিকা

মানবসম্পদ উন্নয়নে মুখ্য উপাদান হলো শিক্ষা । কোন দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি হলেও তাকে মানবসম্পদ বলা যাবে না যে পর্যন্ত না এর বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষিত, দক্ষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় । শিক্ষা মানুষের গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে দক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তরিত করে । শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে প্রাকৃতিক সম্পদের মতো মানুষকেও সম্পদে পরিণত করে । বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানবসম্পদ উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । নিম্নে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **আত্মনির্ভরতা অর্জন :** শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে । শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের পথ খুঁজে পায় । আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি হয় । নিরক্ষর ব্যক্তির জ্ঞান আহরণের পথ অত্যন্ত কম । পাঠে অক্ষম বলে নিরক্ষর ব্যক্তি কেবল অন্যের কথা, আলাপ-আলোচনা শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । নিরক্ষর ব্যক্তি অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে স্বার্থান্বেষী মহল সহজেই নিরক্ষরদের বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে পারে । কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মনির্ভর । সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিভিন্ন বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে । নিজের ওপর আস্থা রাখে । তার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

২. **পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি :** শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে । শিক্ষিত ব্যক্তি সারা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা রাখে । এসব বিষয় তার মধ্যেও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে ।

৩. **পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা :** মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্বাক্ষরতা অর্জনের আগে ও পরে সমাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । সংক্ষেপে বলা যায়, একজন স্বাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতায় তীক্ষ্ণধী এবং পরিবেশের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী । শিক্ষা মানুষকে আবেগ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে স্বচ্ছ চিন্তা করতে শেখায় । এর ফলে তারা ব্যক্তিগত এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয় । ফলে তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় ।

৪. **সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি :** শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও গণতান্ত্রিক করতে সাহায্য করে । শিক্ষা মানুষের চেতনার উন্মোষ ঘটায় । পত্রপত্রিকা পাঠ, আলাপ-আলোচনা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ফলে ব্যক্তি জীবনের ওপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয় । তারা বুঝতে শেখে ব্যক্তির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে নিহিত, তখন তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে শেখে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে । মানুষ উপলব্ধি করে আর্থ-সামাজিক জীবনের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ উদ্যোগ অধিকতর ফলপ্রসূ । এই উপলব্ধি থেকেই তারা সংঘবদ্ধ হতে শিখে এবং ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজসেবী সংগঠন, সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সংগঠন গড়তে উদ্যোগী হয় ।

৫. **নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটায় :** শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানে এবং দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে । অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় । সুশিক্ষিত ব্যক্তি গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে ।

৬. **কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি :** একজন স্বাক্ষরকর্মী নিরক্ষরকর্মীর চেয়ে অধিকতর 'কর্মদক্ষ'। কারণ সাক্ষর ব্যক্তির চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ, আত্মমূল্যায়ন ও সংশোধন এবং কর্মজীবনের কর্মসম্পাদন ও কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষমতা নিরক্ষর ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া নিজ পেশা সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও স্বাক্ষর ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয়। দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কাজের আনন্দ বিদ্যমান। এই কাজের আনন্দই কর্মীর কর্মনৈপুণ্য আরো বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া শিক্ষা মানুষের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে এবং নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়।

৭. **সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা :** সর্বজনীন শিক্ষা সুষম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষরা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শুধু যে তাদের আয় বাড়ানোর সুযোগ পায় তাই নয়, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণ ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের জীবনের মান তারা কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়।

৮. **স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবার পরিকল্পনা :** নিরক্ষরদের চেয়ে স্বাক্ষর ব্যক্তি স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিক সচেতন। স্বাক্ষর ব্যক্তি স্বাস্থ্যহানির কুফল সম্পর্কে অধিকতর সচেতন বলে রোগ-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে নিরক্ষর ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে উদাসীন থেকে প্রতিরোধযোগ্য রোগের কবলে পড়ে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা দুই-ই হারায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিকল্পিত পরিবারের সুফল সম্পর্কে সচেতন ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলেই তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ নিরক্ষর উদাসীন থাকে বলে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পরিকল্পিতভাবে বাড়তে থাকে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন সংকটে পতিত হয়।

৯. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে এবং স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ অন্যের পরিবেশকে জানতে পারে। ফলে তারা নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারে এবং নিজের জীবনযাত্রার মান মূল্যায়ন করে তার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা পরিবারের আকৃতি ছোট রেখে পোষ্যদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির সংস্থান করতে সচেষ্ট হয় অন্যদিকে নিরক্ষর মানুষ রোগ, শোক, দারিদ্র্য ইত্যাদিকে ভাগ্যের ফল হিসেবে গ্রহণ করে এবং সমাজে মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

১০. **সুনীতি শিক্ষা ও দেশপ্রেমে দীক্ষা :** সুনীতি ও দেশপ্রেমের দীক্ষার জন্য সুশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জোরালো হলে এবং দেশপ্রেম জাগ্রত থাকলে সে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে। এ ধরনের ব্যক্তি অর্থাৎ সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত হবে।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যক্তির গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে। শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বাস্থ্যবিধি ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ব্যক্তি তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার মাধ্যমেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবসম্পদ উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে–

(ক) গণমাধ্যম (খ) রাজনৈতিক সচেতনতা

(গ) শিক্ষা (ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

২। শিক্ষার প্রয়োজন–

(ক) আত্মনির্ভরতা সৃষ্টির জন্য (খ) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

(গ) সচেতনতা সৃষ্টির করতে (ঘ) উপরের সবকটি

৩। কে বেশি স্বাস্থ্য সচেতন?

(ক) অশিক্ষিত ব্যক্তি (ঘ) ধনী ব্যক্তি

(গ) শিক্ষিত ব্যক্তি (ঘ) মোটা ব্যক্তি

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অবদান আলোচনা করুন।

২। কিভাবে শিক্ষা ব্যক্তিকে সম্পদে পরিণত করে ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ঘ), ৩। (গ)

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নয়ন করতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষা 'পুঁজি বিনিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।' অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করলে সর্বাধিক লাভ পাওয়া যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ C. P. Snow বলেছেন, আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সকল উন্নয়নের ভিত্তি শিক্ষা। উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা বিদ্যমান। নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা

পাঠ্য-পুস্তকের সংকট : বই-পুস্তকের সংকট বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক সমস্যা। প্রতি বছর দেখা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দু'মাস অতিবাহিত হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সকল বই পৌঁছে না। দেশের মুষ্টিমেয় রাঘব-বোয়াল নিজস্ব স্বার্থে পুস্তক প্রকাশনাকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে তাদের পাঠ্যপুস্তক পায় না।

সেশন জট

আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সেশন জট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। অতি সামান্য কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছাত্র সংগঠনগুলো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে দ্বিধা করছে না। যার ফলে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ নিত্যনৈতিমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তথাকথিত ছাত্র নামধারীদের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের ফলে ৪ বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে কমপক্ষে ৭ বছর সময় লাগছে। সেশন জটের কারণে অতিরিক্ত ৩/৪ বছর সময় ব্যয় করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং সরকার।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গণে ছাত্ররাজনীতির অতীত ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আদর্শ-বিবর্জিত সামরিক-বেসামরিক রাজনীতিকরা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করেছে। ফলে শিক্ষাঙ্গণ পরিণত হয়েছে রণাঙ্গণে। অজস্র ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। তাই বলা যায় কলুষিত ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গণের সামগ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করেছে।

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি

বর্তমানে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছাত্র নামধারী কতিপয় বখাটে যুবক শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। তারা কতিপয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া থেকে শিক্ষাঙ্গণে টেণ্ডারবাজি, দরপত্র

জমাদানে বাধা প্রদান, সন্ত্রাস ও চাঁদা আদায়ে লিপ্ত থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মানসম্মত নয়। অনেক কিণ্ডারগার্ডেন, কোচিং সেন্টার, নোট বই ও প্রাইভেট টিউশনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সমস্যা প্রতিকারের সুপারিশ : বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে–

(১) **বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ :** বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা ও ব্যাপক দারিদ্র্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সর্বাধিক গুরুত্বের পাশাপাশি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদিও সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ যথেষ্ট নয়, মানসম্মত শিক্ষক, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেতনাদি সম্পর্কেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষকদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আন্তরিকতা বাড়বে।

(২) **পাঠ্যসূচির আমূল পরিবর্তন :** বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক্ষেত্রে শিক্ষাসূচির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। যা জ্ঞান, দক্ষতা ও মৌলিক উৎকর্ষকে উৎসাহিত করবে। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বরাদ্দকৃত বাজেটে ছাত্রবৃত্তি, স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়সমূহের সংযুক্তি আবশ্যক। তাছাড়া কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য মোকাবেলায় উপযুক্ত পথ বেছে নিতে হবে।

(৩) **আর্থিক সহযোগিতা দান :** এদেশের অভিভাবকরা দারিদ্র্যের কারণে অনেক সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে অর্থ আয়ের উদ্দেশ্যে কাজে যেতে বাধ্য করেন। এসব ছাত্রকে স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাদেরকে স্কুলে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) **ছাত্র-রাজনীতি পুনর্গঠন :** বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো কলুষিত ছাত্র-রাজনীতি। মূলত শিক্ষাঙ্গণে অস্থিরতা রোধে ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা এবং এজন্য রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য ও সদিচ্ছার বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি।

(৫) **তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা :** নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য অধিক হারে নারী শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান সরকারি পদক্ষেপের আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তির চলমান বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার ও ব্যক্তি খাতে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটাতে হবে।

(৬) **সেশন জট ও নকল দূরীকরণ :** বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সেশন জটের কারণে ৩ বছরের কোর্স শেষ করতে ৭ বছর লেগে যায়। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে উচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এরূপ সেশন জট না থাকে। আবার সরকারের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে, যাতে নকলমুক্ত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়ে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে তাদের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করতে পারে।

(৭) **বাজেটে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি :** শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান শিক্ষাক্ষেত্রে ২৫ ভাগ বরাদ্দ রেখেছিল। আমাদের সেই দৃষ্টান্ত মনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক সমস্যা দূর হবে।

(৮) **সুষ্ঠু পরিকল্পনা :** শিক্ষার সমস্যা দূরীকরণ ও মানসম্পন্ন শিক্ষা দানের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এজন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে যাতে সরকার পরিবর্তিত হলেও পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা বিদ্যমান। পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, সেশন জট, শিক্ষক সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের জন্য চাই সুশাসন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। মনে রাখতে হবে সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি শিক্ষা। কাজেই শিক্ষাকে অবহেলা করে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি হলো —।

২। শিক্ষা সমস্যা দূর করতে — পরিকল্পনা দরকার।

৩। পাঠ্য-পুস্তক সঙ্কট শিক্ষার অন্যতম — সমস্যা।

৪। আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় — অনিবার্য।

৫। ছাত্ররাজনীতির অতীত ইতিহাস অত্যন্ত —।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।

২। শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। শিক্ষা, ২। সুষ্ঠু, ৩। প্রধান, ৪। ধ্বংস, ৫। উজ্জ্বল